ছোট গল্প

ছবি

আহমেদ সাবের

- ১ -

গত পাঁচ বছরে পুরো এলাকার চেহারা একেবারেই বদলে গেছে। যেখানে পুরো এলাকায় একটা পাকা বাড়ীও ছিল না, সেখানে এখন একটা পুরোনো টিনের চালের ঘর মেলাই দুস্কর। মোবারক সাহেবের কাছে যে কনষ্ট্রাকশন কোম্পানীর লোকজন আসেনি, তাও নয়। কিন্তু গড়িমসি করে কারও সাথে চুক্তিবদ্ধ হননি এতদিন। শেষে ছেলে-মেয়েরা যেভাবে ধরে পড়লো, আর না করতে পারলেন না।

নিরূপম কনষ্ট্রাকশনের সাথে চুড়ান্ত কথাবার্তা হয়ে গেছে। পুরানো টিনের ঘর ভেঙ্গে ওরা বারোটা ফ্ল্যাট করবে। তার থেকে চারটে পাবেন মোবারক সাহেব। বাকী আটটা নেবে ওরা। আগামী মাস থেকে কাজ শুরু হবে।

চুক্তি সই করবার পর হৃদয় গভীর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস উঠে আসে মোবারক সাহেবের। কত স্মৃতি জড়িয়ে আছে বাড়ীটায়। কেরানীর চাকরী নিয়ে যখন ঢাকায় এলেন, উঠলেন এক রুমের একটা ভাড়া বাসায়। বিয়ে করলেন। স্ত্রী রোকেয়াকে নিয়ে শুরু হলো দু জনের সংসার। প্রথম সন্তান আমজাদের জন্মের পর, ছোট বাসাটাতে আর কুলালো না। শুরু হলো, দু-রুমের একটা বাসা খোঁজার। কিন্তু মোবারক সাহেবের সামান্য বেতনে অফিসের কাছাকাছি দু-রুমের বাসা জোগাড় করা সম্ভব হলো না। অগত্যা, শহর থেকে দুরে বাসাবোর প্রান্তে এ বাড়ীটা ভাড়া নেওয়া।

চারদিকে ধান ক্ষেত। মাঝখানে দ্বীপের মতো জেগে থাকে বাড়ীটা। কামলাদের থাকার জন্য বোধহয় বানানো হয়েছিল বাড়ীটা। বর্ষায় নৌকা চলে পাশ দিয়ে। মাঝে মঝে সাপ উঠে ভিটেয়। আশেপাশে আর কোন বাড়ী নেই, ঘর নেই, এমনকি রাস্তাও নেই। বাড়ী আর পাশের সব জমির মালিক, এ্যাডভোকেট জাফরউল্লাহ তখন বৃদ্ধ। ধীরে ধীরে বিক্রি করে দিচ্ছেন জমি জমা। বছর খানেক থাকার পর একদিন মোবারক সাহেবকে জিজ্ঞেস করলেন, বাড়ীটা কিনবেন কিনা। মোবারক সাহেবের সাহস হয়না। সামান্য বেতনের চাকরী। তবু স্ত্রী রোকেয়া বেগমের সাহস পেয়ে গ্রামের জমি বিক্রি করে এ বাড়ীটা কিনে ফেললেন। সেও প্রায় চল্লিশ বছর আগের কথা।

ঢাকা শহরে লোক বাড়তে লাগলো। আস্তে আস্তে এ অঞ্চলেও লোক আসা শুরু হলো। পানির লাইন এলো, বিদ্যুত এলো, রাস্তা হলো। আর বাংলাদেশ হবার পর, ঢাকার অন্য যায়গাগুলোর মত, বাসাবোও সয়লাব হয়ে গেল মানুষে আর মানুষে। জমির দাম বেড়ে গেল হু হু করে।

বাড়ী ছাড় বললেই কি আর ছাড়া যায়? ঝামেলা কি কম। একটা বাসা ভাড়া করতে হবে। বাড়ী ছেড়ে ভাড়া বাসায় উঠতে হবে। উঠ বললেইতো আর উঠা হয়ে গেল না। সারা জীবনের সঞ্চয়, দরকারী, বে-দরকারী সামগ্রীর স্তুপ। কোনটা রাখতে হবে, কোনটা ফেলতে হবে - ঠিক করাটাই বিরাট ঝক্কি ঝামেলার ব্যাপার।

- ২ -

আমজাদের বড় ছেল্লে পরাগের সাথে জিনিষ গুছাচ্ছেন মোবারক সাহেব। পুরোনো ট্রাঙ্কে জিনিষ পত্রের স্তুপ। কোনটা ফেলছেন, কোনটা রাখছেন। ঘটতে ঘাটতে ট্রাঙ্কে তলা থেকে রোকেয়াকে লেখা চিঠির বান্ডিলটা হাতে উঠে এল ওর।

ওগুলো কি দাদা? পরাগের প্রশ্ন।

কিছুনা। দাদাভাই তুমি পড়ার ঘরের জিনিষগুলো গুছাও। এখানে ধুলার মধ্যে তোমার শ্বাসকষ্ট বেড়ে যাবে। মোবারক সাহেব তড়িঘড়ি করে বলে উঠেন।

একটু একা থাকতে চান তিনি রোকেয়ার স্মৃতিকে নিয়ে।

পরাগ যেতেই চিঠির বান্ডিল থেকে একে একে চিঠিগুলো বের করতে থাকলেন মোবারক সাহেব। সারা জীবনই একসাথে থেকেছেন। চিঠি লেখার তেমন সুযোগ পান নি তিনি। কিন্তু চিঠি লেখার সখটা বরাবরই ছিল। কালে ভদ্রে দু এক দিনের জন্যও একা কোথাও গেলে, খুব সুন্দর করে চিঠি লেখতেন রোকেয়াকে। বেশীর ভাগ সময়ই, চিঠি আসার আগে তিনি এসে গেছেন বাড়ীতে। রোকেয়া সব চিঠিগুলো যত্ন করে গুছিয়ে রেখেছে। একটাও ফেলেনি।

দেখতে দেখতে, চিঠির বান্ডেলএর নীচে রাখা ছবিটা হঠাৎ করে মোবারক সাহেবের হাতে উঠে এলো।

বিয়ের পর এক ছুটিতে রোকেয়াকে নিয়ে কক্সবাজার বেড়াতে গিয়েছিলেন তিনি। ছবিটা সেখানে তোলা। দু দিনের জন্য কক্সবাজার যাওয়া। প্রথমদিন কেটে গেছে উচ্ছাসের ঝোঁকে স্বপ্নের মতো। দ্বিতীয়দিন বিকেলে সমুদ্র সৈকতে বসে আছেন দুজন। কাল ফিরে

আসবেন ঢাকায়। সূর্য্য হেলে পড়েছে পশ্চিমে। অস্ত যাবে একটু পর। একটা ক্যামেরাম্যান ধরে বসেছে নাছোড়বান্দার মত, ছবি তোলার জন্য। মোবারক সাহেবের চিন্তা, ছবি তুললেতো হবেনা। কাল ভোরে চলে যাবেন, ছবি পাবেন কি করে? তখনতো আজকালকার মতো ছবি তুলে সাথে সাথে প্রিন্ট করবার ব্যাবস্হা ছিল না। ছবি তোলার পর নিগেটিভ করা হতো, তার পর প্রিন্ট। এক দিন তো লেগেই যেতো।

ক্যামেরাম্যান আস্বস্ত করলো, কোন চিন্তা নেই। ছবি ডাকযোগে পাঠানো যাবে। মোবারক সাহেবের সন্দেহ যায়না। ব্যাটা যদি ফাঁকি দেয়? শেষে রোকেয়াকে নামতে হলো, স্বামীকে বোঝানোর জন্য। গেলে যাবে। এত কষ্ট করে আসা। একটা ছবি না থাকলে কি যেন অপূর্ন থেকে যায়। দেখনা, কত লোক ছবি তুলছে। ওরা যদি ফাঁকি দিত, তা হলে মানুষ কি ছবি তুলতো। শেষে স্ত্রীর আগ্রহেই রাজী হলেন মোবারক সাহেব।

সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে। একটা বালুর ডিবির উপর সামনা সামনি দুজনকে বসিয়ে দিলেন ক্যামেরাম্যান। দু জনকে দেখিয়ে দিলেন কেমন করে তাকাতে হবে, কি করে মাথা বাঁকাতে হবে। এবং তারপর বক্স ক্যামেরায় ক্লিক।

ঢাকায় আসার পরও মোবারক সাহেবের অস্থিরতা আর যায়না, ছবিটা যদি না আসে। না, ছবিটা শেষমেষ এলো বটে, আট দিন প্রতিক্ষার পর। আর ছবিটা দেখার পর মোবারক সাহেবের চক্ষু ছানাবড়া। ক্যামেরাম্যান দুজনকে যেভাবে বসতে বলেছিলো, সেভাবেই বসেছিলেন দুজন। সে যে ক্যামেরার কারসাজি করে এমন একটা অন্তরঙ্গ ছবি তুলে ফেলবে, সেটা ঘুর্নাক্ষরেও মনে আসেনি তার। পেছনে সূর্য্য ডুবছে। সামনা সামনি বসে দুজন। ছবিটাতে মনে হচ্ছিল, একজনার ঠোঁট যেন ছুয়ে আছে আরেক জনের ঠোঁট।

কাজটা তোমার। দেখলে মনে হয়, ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জাননা, আর তলে তলে যত কু-বুদ্ধি। ক্যামেরাম্যানকে পরামর্শ দিয়ে এ কান্ডটা করিয়েছ তুমি। রোকেয়া বলে উঠেন।

সত্যি বলছি রোকেয়া, তোমার গা ছুয়ে বলছি, আমি কিছুই জানিনা।

তা এত লজ্জা পাচ্ছ কেন? থাকলোই বা একটা স্মৃতি। মুখ টিপে হাসেন রোকেয়া।

একটা পুরোনো ফ্রেমে বাধিয়ে, সাহস করে শোবার ঘরের দেয়ালে ছবিটা ঝুলিয়েছিলেনও মোবারক সাহেব। বড় ভাবী বেড়াতে এসে ছবিটা দেখে কি ঠাট্টা। তবুও ছবিটা থেকেছিল দেয়ালে অনেক দিন। শেষে যখন ছেলেমেয়েরা বড় হলো, একদিন নিজ থেকেই ট্রাঙ্কে তুলে রাখলেন রোকেয়া।

ক্যান্সারে মারা যাবার আগে একরাতে রোকেয়া বেগম চিঠির বান্ডিল খুলে বসেছিলেন। ছবিটা দেখে ওর গালে পড়েছিল লালচে আভা।

আমি মারা যাবার পর চিঠিগুলা আর ছবিটা আমার কবরে দিয়ে দিও। মোবারক সাহেবের হাত ধরে রোকেয়া বেগমের অনুরোধ। সেটাই বোধ হয় শেষ অনুরোধ।

কিন্তু দেয়া হয়নি। রোকেয়ার মৃত্যতো হঠাৎ করে আসেনি। বলে কয়ে জানান দিয়ে এসেছে। তবুও রোকেয়া মারা যাবার পর কেমন বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন মোবারক সাহেব। ছেলে আমজাদই সব সামলিয়েছে। এর পরও কতদিন কেটে গেছে। কিন্তু রোকেয়াকে দেয়া কথাটা মনে পড়েনি তার। রোকেয়ার শেষ অনুরোধটা আর রাখা হয়নি। মোবারক সাহেবের চোখ দুটো ভিজে আসে অশ্রুতে।

- ৩ -

টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। এখন অপরাহ্ন। এক হাতে একটা বাজারের থলে আর অন্য হাতে একটা ছাতা নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন মোবারক সাহেব। আসবার আগে আমজাদের স্ত্রীকে শুধু বলে এসেছেন, বউমা, একটু বাইরে যাচ্ছি, ফিরতে সন্ধ্যে হবে।

মীরপুর কবরস্থানে পৌঁছাতে পৌঁছাতে বৃষ্টি ধরে গেলে। ভেজা মাটি খুড়তে কষ্ট হচ্ছেনা মোবারক সাহেবের।

দুজন পথচারী হেটে যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে। একজন আরেক জনকে বলছে, ফুল গাছ লাগাইবো বোধ হয়।

Sydney September 9 - 11, 2009